দ্বাদশ শ্রেণী

বিষয়:- ইতিহাস, অধ্যায়:- ঔপনিবেশিক আধিপত্যের প্রকৃতি:নিয়মিত ও অনিয়মিত সাম্রাজ্য

প্রশ্নঃ ১ ভারতের ইতিহাস রচনায় উপযোগবাদী জেমস মিল এর দৃষ্টিভঙ্গি লেখো।

উত্তরঃ উপযোগবাদের অন্যতম সেরা প্রচারক এবং বেন্থামের প্রিয় শিষ্য ছিলেন জেমস মিল। তিনি উপযোগবাদী দর্শনকে তাঁর চিন্তাভাবনা এবং উদ্ভাবনী শক্তির মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, "An Essay on Government", "Laws of Nations", "An Analysis of the Phenomena of the Human Mind", "Principles of Political Economy and Taxation" প্রভৃতি।

মিল তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্রভাবনাকে উপযোগবাদের মূল নীতির ওপর ভিত্তি করে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষার প্রসারের ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি জনপ্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থ সুরক্ষিত করাই হবে জনপ্রতিনিধিদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করতেন। তবে তিনি ভোটদানের অধিকারকে সর্বজনীন করতে চাননি। কেবলমাত্র শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিকেই তিনি ভোটাধিকার দানের কথা বলেছেন কারণ তাঁর মতে, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিই হল সমাজের বৃহৎ অংশ এবং এরাই সমাজের স্বার্থরক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা পালনে সক্ষম। তবে নারী, শিশু এমনকি চল্লিশ বছরের কমবয়সি পুরুষকেও তিনি ভোটাধিকার দানের বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, এরা নিজেদের স্বার্থ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে। তাই তিনি একমাত্র চল্লিশ বা তার বেশি বয়সের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পুরুষদেরকেই ভোটাধিকার দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন। জনপ্রতিনিধিরা যাতে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে না পড়ে সে কারণে তাদের ক্ষমতা ভোগের সময়সীমা হবে অল্পদিনের। এজন্য তিনি আইনের সংস্কারেরও দাবি জানান। একইসঙ্গে তিনি বিচারব্যবস্থারও আমূল সংস্কারের দাবি করেন। 'Laws of Nations' গ্রন্থে তিনি আন্তর্জাতিক আইন রচনার প্রস্তাব দেন এবং এই আইনের রক্ষণাবেক্ষণ একটি আন্তর্জাতিক বিচারালয় স্থাপনেরও প্রস্তাব দেন। সর্বোপরি তিনি ছিলেন মানুষের সার্বিক সুখ দেওয়ার পক্ষপাতি। স্বাভাবিকভাবে যে নীতি মানুষকে সুখ ও আনন্দ দান করেছিল মিল ছিলেন সেই নীতির একান্ত সমর্থক।

প্রশ্নঃ ২ রেলপথ স্থাপনে "গ্যারান্টি প্রথার" ভূমিকা লেখো।

উত্তরঃ **গ্যারান্টি প্রথাঃ** রেলপথ নির্মাণের জন্য পুঁজির জোগানকে সুনিশ্চিত করতে, বেসরকারি উদ্যোগ উৎসাহিত করতে এবং বেসরকারি কোম্পানিগুলির আর্থিক লাভের নিশ্চয়তা দানে সরকার কিছু প্রতিশ্রুতি দেয়। এই প্রতিশ্রুতিই 'গ্যারান্টি প্রথা নামে পরিচিত। 1849 খ্রিস্টাব্দে ভারতবর্ষে গ্যারান্টি প্রথার প্রবর্তন ঘটে।

শর্তসমূহঃ গ্যারান্টি প্রথার শর্তগুলি ছিল— **(ক)** বেসরকারি কোম্পানির লগ্নি করা মূলধনের ওপর অধিক শতকরা পাঁচ টাকা হারে সুদ দেওয়া হবে। **(খ)** সরকার কোম্পানিগুলিকে 5 শতাংশ লাভের গ্যারান্টি দেয়। বার্ষিক 5 শতাংশের কম লাভ হলে সরকার থেকে সেই ঘাটতি পূরণ করা হবে। **(গ)** লভ্যাংশ 5 শতাংশর বেশি হলে তা সরকার ও কোম্পানির মধ্যে সমভাবে বন্টিত হবে। **(ঘ)** 25 বা 50 বছর পর সরকার ইচ্ছা করলে রেলপথগুলি কিনতে পারবে। **(ঙ)** 6 মাসের নোটিশে লগ্নিকারী কোম্পানিগুলি তার লগ্নিকৃত অর্থ ফেরত পাবে। **(চ)** সর্বোপরি কোম্পানিগুলিকে রেলপথ স্থাপনে বিনামূল্যে জমি দেওয়া হবে। এই কলেজটি বন্ধ করে ইংল্যান্ডের হেইলিবেরিতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ' স্থাপন করে সেখানে তরুণ সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালকবর্গের সুপারিশের মাধ্যমেই এই সকল পদে নিয়োগ হত। লর্ড বেন্টিঙ্ক সর্বপ্রথম শাসনক্ষেত্রে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভারতীয় কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি করেন। 1853 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে তা পরিবর্তন করে ইংল্যান্ডে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষায় ইংল্যান্ডের রাজার অধীনস্ত যে-কোনো প্রজা অংশ নিতে পারবে এবং তাদের বয়স হতে হবে 18 থেকে 23 বছরের মধ্যে।

প্রশ্নঃ ৩ ভারতে আমলাতন্ত্রের বিবর্তন লেখো।

উত্তরঃ ড. বিপানচন্দ্রের মতে, ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা তিনটি স্তম্ভের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। এগুলি হল—সিভিল সার্ভিস, সৈন্যবাহিনী এবং পুলিশবাহিনী (The British Administration in India was based on three pillars: The Civil Service, The Army and the Police)।

কর্নওয়ালিশের অবদানঃ ভারতে সিভিল সার্ভিসের প্রকৃত প্রবর্তক ছিলেন লর্ড কর্নওয়ালিশ। তিনি প্রশাসনকে সৎ, দক্ষ ও দুর্নীতিমুক্ত করতে কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তিনি কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করেন। কর্মচারীদের কিছু বিধিনিষেধ ও নিয়মকানুন মেনে চলার নির্দেশ দেন যা 'কর্নওয়ালিশ কোড' নামে পরিচিত ছিল। তবে ভারতীয়দের কোনো উচ্চপদে নিয়োগ করা হত না। কেন-না ব্রিটিশরা মনে করত ভারতীয়রা ছিল অলস এবং অসংঘবদ্ধ একটি জাতি। এ ছাড়া 1793 খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে নিয়ম চালু করা হয়েছিল যে, বছরে 500 পাউন্ডের বেশি বেতনের চাকুরিতে কেবলমাত্র ইংরেজদের

নিয়োগ করা হবে। এইভাবে কোম্পানির উচ্চপদ থেকে যোগ্য ভারতীয়দের বঞ্চিত করে দেশীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে স্থায়ী বিভেদ সৃষ্টি করা হয়।

ক্রমবিবর্তনঃ 1800 খ্রিস্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন করে সিভিল সার্ভেন্টদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেন। 1802 খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি এই কলেজটি বন্ধ করে ইংল্যান্ডের হেইলিবেরিতে 'ইস্ট ইন্ডিয়া কলেজ' স্থাপন করে সেখানে তরুণ সিভিলিয়ানদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এ পর্যন্ত কোম্পানির পরিচালকবর্গের সুপারিশের মাধ্যমেই এই সকল পদে নিয়োগ হত। লর্ড বেন্টিঙ্ক সর্বপ্রথম শাসনক্ষেত্রে উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভারতীয় কর্মচারীদের বেতনও বৃদ্ধি করেন। 1853 খ্রিস্টাব্দের সনদ আইনে তা পরিবর্তন করে ইংল্যান্ডে একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয় সিভিলিয়ানদের নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়। এই পরীক্ষায় ইংল্যান্ডের রাজার অধীনস্ত যে-কোনো প্রজা অংশ নিতে পারবে এবং তাদের বয়স হতে হবে 18 থেকে 23 বছরের মধ্যে।

প্রশ্নঃ ৪ দ্বৈত শাসন ব্যবস্থা বলতে কি বোঝো? এর ফলাফল লেখো।

উত্তরঃ বক্সারের যুদ্ধের পর কোম্পানির পক্ষে যে অনুকূল রাজনৈতিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তার সদ্ব্যবহার করেন রবার্ট ক্লাইভ। দেওয়ানি লাভ করার পর ক্লাইভ আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব দেন বাংলার নবাবের ওপর। রাজস্ব আদায়ের অধিকার কোম্পানি নিজেদের হাতে রাখে। একেই বলে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা। এর ফলে নবাবের হাতে থাকে ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং কোম্পানির হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা।

ফলাফল:

● **বিপর্যস্ত জনজীবন:** দ্বৈত শাসনের আর-এক নাম ছিল কুশাসন। এই ব্যবস্থার ফলে গ্রাম-বাংলার জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। রাজস্ব আদায়ের জন্য কোম্পানি নিলামের মাধ্যমে ইজারাদারদের ভূমি বন্দোবস্ত দিত। ফলে, শোষণ ছিল অবশ্যম্ভাবী। অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করতে না-পারলে 'আমিল'-দের চাকুরি থাকত না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আলিবর্দি খাঁ-র আমলে পূর্ণিয়া থেকে 4 লক্ষ টাকা আদায় করা হয়েছিল। কোম্পানির আমলে রেজা খাঁ-র আমিল সুচেতন রায় পূর্ণিয়া থেকে দু-বছরে রাজস্ব আদায় করেছিল 24 লক্ষ টাকা।

● **দুর্নীতি:** দ্বৈত শাসনের পর কোম্পানির কর্মচারীরা দুর্নীতি ও অবৈধ ব্যাবসায় লিপ্ত হয়। স্বয়ং ক্লাইভ মন্তব্য করেছিলেন যে, 'পৃথিবীর আর কোনো অঞ্চলে বাংলাদেশের মতো এরকম উৎকোচ, দুর্নীতি, পীড়ন ও শোষণের ঘটনা কেউ শোনেনি। এত বিপুল সম্পদ এমন অবৈধ উপায়ে, উন্মত্ত লালসার প্রেরণায় আর কোনো দেশ থেকে লুণ্ঠিত হয়নি।

● **কুটিরশিল্পের ধ্বংসসাধন:** দ্বৈত শাসনের ফলে বাংলার কুটিরশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। বহু মানুষ বেকার হয়ে পড়ে। দেশে চুরি, ডাকাতি, অরাজকতা শুরু হয়।

প্রশ্নঃ ৫ চিনের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসম চুক্তির বৈশিষ্ট্যগুলো লেখো।

উত্তরঃ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা চিনের ওপর আরোপিত অসম চুক্তিগুলির কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন:

● **একতরফাভাবে চুক্তি আরোপ:** চিনের সঙ্গে কোনো আলোচনা ছাড়াই ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি একতরফাভাবে অসম চুক্তিগুলি আরোপ করেছিল। পশ্চিমি শক্তিগুলির কাছে বিভিন্ন যুদ্ধে পরাজিত চিনের ওপর এই অসম চুক্তিগুলি একতরফাভাবে চাপিয়ে দেওয়া হত। এক্ষেত্রে চিনের কোনো অভিমত নেওয়া হত না।

● **চিনের সার্বভৌমিকতায় আঘাত:** ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দ্বারা আরোপিত বিভিন্ন অসম চুক্তি চিনের সার্বভৌমিকতায় আঘাত হানে। এই আঘাত সামলানো চিনের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। চিন ক্রমশ পশ্চিমি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির 'আধা উপনিবেশ'-এ রূপান্তরিত হয়।

● **চিনের ওপর ভৌগোলিক আধিপত্য:** অসম চুক্তিগুলির মধ্য দিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিধর রাষ্ট্র চিনের ওপর ভৌগোলিক আধিপত্য স্থাপন করতে থাকে। এর ফলে চিনের প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর তাদের সরকারের ক্ষমতা হ্রাস পায়। আর এই কারণে বিদেশি শক্তিগুলি সহজেই সেই দেশের দখলীকৃত অঞ্চলগুলিতে নিজেদের ক্ষমতা জাহির করতে সক্ষম হয়।

● **ক্ষতিপূরণ আদায়:** চিনের সঙ্গে বিদেশি শক্তিগুলির যুদ্ধের জন্য চিনকেই কেবলমাত্র দায়ী করা চলে না। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জোর করে যুদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব চিনের ওপর চাপিয়ে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন অসম চুক্তি অনুযায়ী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ বিপুল পরিমাণ অর্থ ইউরোপীয় শক্তিগুলির হাতে তুলে দিতে চিন বাধ্য হয়।।

● **বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধা আদায়:** বিভিন্ন অসম চুক্তির কারণে চিন নিজ দেশের বিভিন্ন বন্দর বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির কাছে উন্মুক্ত করতে বাধ্য হয়। যেমন-হংকং বন্দর ব্রিটেনের জন্য বা ম্যাকাও বন্দর পোর্তুগালের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। তবে অসম চুক্তির জন্য বিদেশি শক্তিগুলি বাণিজ্য ছাড়া অন্যান্য সুবিধাও চিনের কাছ থেকে আদায় করেছিল।

● **চিনের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদের ওপর দখল:** ইউরোপের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির লোলুপ দৃষ্টি থেকে চিনের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদও বাদ পড়েনি। সেই কারণে বিদেশি

শক্তিগুলি বিভিন্ন অসম চুক্তি দ্বারা চিনের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ দখল করে নেয়। চিনের খনিজ সম্পদ জলপথে বিদেশে রপ্তানি করে ইউরোপীয় দেশগুলি নিজেদের অর্থনীতি ও শিল্পকে উন্নত করে।

● **বাণিজ্য শুল্কে ছাড়:** বিদেশি শক্তিগুলি চিনের সঙ্গে অসম চুক্তি স্বাক্ষর করে বাণিজ্যিক শুল্কে ছাড় আদায় করে। চিনা বণিকরা তাদের সরকারকে ন্যায্য শুল্ক দিয়ে বাণিজ্য করলেও বিদেশি বণিকরা শুল্কে ছাড় পেত। ফলে ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পোর্তুগালের মতো দেশগুলি অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারত।

● **উপসংহার:** বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি চিনের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থরক্ষার জন্য বিভিন্ন অসম চুক্তি করেছিল। ইউরোপীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন যুদ্ধে চিনের পরাজয়ই এর প্রধান কারণ ছিল। বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে চিনে প্রজাতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত হলে অসম চুক্তিগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায়।

প্রশ্নঃ ৬ চিনের উপর চাপিয়ে দেওয়া অসম চুক্তিগুলি সম্পর্কে লেখো।

উত্তরঃ ● **বোগ-এর চুক্তি:** 1843 খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ শক্তি চিনের ওপর বোগ-এর চুক্তি আরোপ করে। এই চুক্তির দ্বারা ইংরেজ শক্তি চিনে কিছু 'অতি-রাষ্ট্রিক অধিকার' অর্জন করে। যেমন—চুক্তি ব্রিটিশ বাসিন্দাদের ওপর চিনের আইন ও প্রশাসনগত নিয়ন্ত্রণ লুপ্ত হয়ে যায়। ওই বাসিন্দারা ব্রিটিশ আইন এবং বিচারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে চিন অন্য বিদেশি রাষ্ট্রকে যে সুবিধাগুলি দেবে সেগুলি ইংল্যান্ডকেও দেবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়।

● **ওয়াংঘিয়ার চুক্তি:** 1844 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক চিনের ওপর ওয়াংঘিয়ার চুক্তি আরোপিত হয়। এই চুক্তি দ্বারা মার্কিন শক্তি চিনে বিশেষ সুবিধা লাভ করে। চিনের চুক্তি বন্দরে বসবাসকারী মার্কিন বন্দরগুলির চিনা ও জনগণ আইন, বিচার, পুলিশ এবং কর সংক্রান্ত সকলপ্রকার স্বাধীনতা অর্জন করে।

● **হোয়ামপোয়ার চুক্তি:** 1844 খ্রিস্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো ফ্রান্স চিনের ওপর হোয়ামপোয়ার চুক্তি আরোপ করে। এই চুক্তি দ্বারা চিনের নতুন পাঁচটি বন্দর ফ্রান্সের বণিকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। ফরাসিরা চিনে বিশেষ সুযোগসুবিধা লাভ করে। পাশাপাশি চিন এবং ফরাসি বণিকদের মধ্যে বণিক শুল্ক নির্দিষ্ট করা হয়।

● **আইগুনের সন্ধি:** 1856 খ্রিস্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স চিনের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধ শুরু করে। এই যুদ্ধে চিনের শোচনীয় অবস্থার সুযোগে রাশিয়া চিনের ওপর আইগুনের সন্ধি (1858 খ্রিস্টাব্দ) আরোপ করে। এই সন্ধির ফলে চিনের উত্তর দিকের কিছু অঞ্চলে রাশিয়ার আধিপত্য

প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া রাশিয়া-চিন সীমান্তবর্তী উসুরি, আমুর ইত্যাদি নদীতে কেবলমাত্র রাশিয়া এবং চিনের আধিপত্য স্বীকৃত হয়।

● **তিয়েনসিনের চুক্তি:** দ্বিতীয় আফিম যুদ্ধে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স চিনকে পরাজিত করে চিনের ওপর তিয়েনসিনের চুক্তি (1858 খ্রিস্টাব্দ) আরোপ করে। এই চুক্তির দ্বারা চিন, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হয়, বিদেশি বণিকদের জন্য চিনের আরও বেশ কয়েকটি বন্দর খুলে দেওয়া হয়, চিনের রাজধানীতে বিদেশি দূতাবাস স্থাপনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, বিদেশি বণিকদের বাণিজ্যের সুবিধার্থে বাণিজ্য শুল্ক কমিয়ে দেওয়া হয়, নির্দিষ্ট শুল্ক প্রদানের মাধ্যমে চিনে আফিমের ব্যাবসা বৈধ হয় ইত্যাদি।

● **পিকিংয়ের সন্ধি:** ভিয়েনসিনের চুক্তি নিয়ে চিনের টালবাহানায় সেদেশের পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠে। এমতাবস্থায় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সকে আরও বেশ কয়েকটি সুবিধা প্রদান করে 1860 খ্রিস্টাব্দে চিন তাদের সঙ্গে পিকিংয়ের সন্ধি স্বাক্ষর করে।

● **শিমোনোসেকির সন্ধি:** কোরিয়ার ওপর আধিপত্যকে কেন্দ্র করে চিন-জাপান যুদ্ধ হয়। ওই যুদ্ধে পরাজিত চিনের সঙ্গে জাপান 1895 খ্রিস্টাব্দে শিমোনোসেকির সন্ধি স্বাক্ষর করে। এই সন্ধির দ্বারা কোরিয়াকে চিন স্বাধীনতা প্রদান করে, চিনের কাছ থেকে জাপান পোর্ট আর্থার বন্দর লাভ করে, জাপানকে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে চিন বাধ্য হয়, জাপানের জন্য চিন তাদের কয়েকটি বন্দর খুলে দিতে একপ্রকার বাধ্য হয়। জাপানের এই সাফল্য দেখে ইউরোপীয় শক্তিগুলি চিনে নিজেদের 'প্রভাবাধীন অঞ্চল' গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক **হ্যারল্ড ভিনাক** এই পরিস্থিতিকে 'চিনা তরমুজের খণ্ডীকরণ' বলেছেন।

প্রশ্নঃ ৭ পলাশি ও বক্সার এর যুদ্ধের গুরুত্বের তুলনামূলক আলোচনা করো।

উত্তরঃ ■ **ভূমিকা:** ভারতের ইতিহাসে পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধ দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 1757 খ্রিস্টাব্দে সিরাজের সঙ্গে সংঘটিত পলাশির যুদ্ধে বাংলায় স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান হয়। অপরদিকে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে ইংরেজদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়। উভয় যুদ্ধের ফলাফলের তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়—

● পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজ কোম্পানি বাংলার স্বাধীন নবাবির অবসান ঘটানোর ফলে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত বাংলার সার্বভৌম ক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতে আসেনি। অপরদিকে বক্সারের যুদ্ধে বাংলা ও অযোধ্যার নবাব এবং মোগল সম্রাটের মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করার ফলে ব্রিটিশ শক্তি বাংলার প্রকৃত নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয়।

● পলাশির যুদ্ধের পরবর্তী সময় ব্রিটিশ কোম্পানি কার্যত একটি রাজস্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন শক্তিশালী রাজন্যবর্গ ব্রিটিশ শক্তির বিরোধিতায় তৎপর ছিল। ফলে বাংলার নবাবের সমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন সাধারণ মানুষের মধ্যে জীবিত ছিল। কিন্তু এই স্বপ্ন বক্সারের যুদ্ধের পর সম্পূর্ণ ভেঙে যায়।

● পলাশির যুদ্ধের পর মিরজাফরকে সিংহাসনে বসিয়ে ব্রিটিশরা বাংলার অর্থ বিভিন্নভাবে লুণ্ঠন করতে থাকে। অপরদিকে বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার অর্থভাণ্ডার ব্রিটিশদের হাতে চলে আসে। ফলে ইংরেজরা স্বাধীনভাবে বাংলার সম্পদ তাদের বাণিজ্যিক ও প্রশাসনিক কাজে ব্যবহার করতে থাকে।

● পলাশির যুদ্ধে জয়লাভ করলেও ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তখনও ব্রিটিশদের সম্মুখে বহু ভারতীয় রাজ্য প্রতিবন্ধক হিসেবে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বক্সারের যুদ্ধের পরবর্তী সময় ব্রিটিশদের নিজ অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আর কোনো যুদ্ধ করতে হয়নি।

■ **উপসংহার:** পরিশেষে বলা যায়, পলাশির যুদ্ধ বাংলার ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, যদুনাথ সরকারের মতে, পলাশির যুদ্ধের ফলে ভারতে মধ্যযুগের অবসান ঘটে এবং আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এই যুদ্ধের ফলেই বাংলার রাজনীতিতে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটে। অপরদিকে 1764 খ্রিস্টাব্দের বক্সারের যুদ্ধকে একটি চূড়ান্ত ফল নির্ণয়কারী যুদ্ধ বলা যায়। এই যুদ্ধে জয়ী ইংরেজরা এ দেশে আধিপত্য স্থাপনের পথে এক ধাপ এগিয়ে যায়। তাই ঐতিহাসিক স্মিথ বলেছেন যে, "Plassey was a connonade while Buxar was a decisive battle."

প্রশ্নঃ ৮ মিরকাশিম এর সঙ্গে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির সংঘাত এর কারনগুলো লেখো।

উত্তরঃ ■ **ভূমিকা:** 1760 খ্রিস্টাব্দে ইংরেজদের সাহায্যে মিরজাফরকে অপসারিত করে মিরকাশিম বাংলার মসনদে বসেন। তিনি দক্ষ ও স্বাধীনচেতা শাসক হওয়ার দরুন ইংরেজদের হাতের পুতুলে পরিণত হতে চাননি। ফলে কয়েক বছরের মধ্যেই মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধের ফলশ্রুতিস্বরূপ যে বক্সারের যুদ্ধ হয় তার একাধিক কারণ ছিল।

● বক্সারের যুদ্ধের কারণঃ

● **রাজধানী স্থানান্তর:** মিরকাশিম সিংহাসনে বসেই ইংরেজদের সমস্ত দাবি মিটিয়ে দেন যাতে ইংরেজরা তাঁর প্রশাসনিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে না পারে। এ জন্য তিনি তাঁর রাজধানী মুরশিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। এটা অবশ্য ইংরেজরা সুনজরে দেখেনি।

● **সেনাবাহিনী গঠন:** মিরকাশিম সিংহাসনে বসার পরেই ইউরোপীয় কায়দায় সেনাবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। তিনি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন করার জন্য সমর্, মার্কার প্রমুখ ইউরোপীয় সেনাপতিকে নিয়োগ করেন। এই ঘটনাও ইংরেজদের ক্ষুব্ধ করে।

● **শুল্ক প্রত্যাহার:** দস্তক ব্যবহার করে ইংরেজ কোম্পানি ও তার কর্মচারীরা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগসুবিধা ভোগ করছিল। দস্তকের অপব্যবহারের দরুন বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির বণিকদের থেকে দেশীয় বণিকরা প্রতিযোগিতায় পিছু হটছিল। এমন পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই মিরকাশিম দেশীয় বণিকদের ওপর থেকেও বাণিজ্যিক শুল্ক প্রত্যাহার করেন।

● **বক্সারের যুদ্ধ:** এইরূপ পরিস্থিতিতে ইংরেজ সেনাপতি অ্যাডামস্ মিরকাশিমের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। কাটোয়া, গিরিয়া ও উদয়নালা-র যুদ্ধ (1763 খ্রিস্টাব্দ)-এ পরাজিত হয়ে মিরকাশিম অযোধ্যায় পালিয়ে যান। সেখানকার নবাব সুজা-উদদৌলা, মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এবং মিরকাশিম একত্রিত হয়ে 1764 খ্রিস্টাব্দের ২২ অক্টোবর ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। এই যুদ্ধটি বিহারের বক্সার নামক স্থানে সংঘটিত হয় বলে একে **বক্সারের যুদ্ধ** বলা হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি মেজর হেক্টর মনরোর বাহিনীর কাছে মিরকাশিমদের সম্মিলিত বাহিনী পরাজিত হয়।